***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 247 – 252*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848*

# অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প 'দেবাংশী' : ম্যাজিক ভাবনা

পরিতোষ ঘোষ
প্রাক্তন ছাত্র, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : paritoshghosh153@gmail.com

## Keyword
ম্যাজিক, ম্যাজিকের ইতিহাস, দেবাংশী গল্পে ম্যাজিক ভাবনা, অভিজিৎ সেনের শ্রেষ্ঠত্ব।

## Abstract
মানুষ সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিকাশে একক ভাবে যদি এমন কোনও সার্বজনীন প্রত্যয়ের কথা সন্ধান করি, যার প্রভাব স্মরণাতীত আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত তা বহমান; তা হল ম্যাজিক তথা জাদুশক্তিতে বিশ্বাস। বস্তু এবং ঘটনার অন্তর্লীন যাদুশক্তি সম্বন্ধে এই অবিরাম বিশ্বজনীন বিশ্বাসের নানা ধরনের অভিব্যক্তিই ধর্ম বিশ্বাস,আচার,সংস্কার প্রথা ইত্যাদি নানান কিছু গড়ে তোলার পিছনে সক্রিয় থাকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে,এই জাদুবিশ্বাস মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামানোর প্রয়াস থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা পর্যন্ত বহুবিধ ব্যাপারের মধ্যেই প্রতিফলিত। বস্তুত পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূজা অর্চনা বিশেষ বিশেষ আচার বিধির পালন ইত্যাদি ব্যাপারগুলি উৎসগত ভাবে এই জাদু বিশ্বাসের অন্তর্গত।এই ধরনের জাদুর প্রয়োগ সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা এখন খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে, কারণ এর সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধ এবং পবিত্রতা ও পবিত্রতার ধারণা জড়িয়ে থাকে। অভিজিৎ সেন মানুষের অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা জাদু বিশ্বাসের বাস্তবতার কথাই বলেন না,যে সমস্ত মানুষ জাদু বিশ্বাসের বাস্তবতার মধ্যে বাস করে তাদের কথাও তুলে ধরেছেন।তিনি অনেক গুলি গল্পে দেখিয়েছেন কিভাবে এই জাদু কেন্দ্রিক বিশ্বাস তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

## Discussion
অভিজিৎ সেন ১৯৪৫ সালের ২৮শে জানুয়ারি পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া হয়ে পুনরায় কলকাতা এই ভাবে ঘুরে ঘুরে স্কুল-কলেজের পড়াশুনা শেষ করেন। চাকরি সূত্রে বেশিরভাগ সময়ই পশ্চিমবঙ্গের দুই দিনাজপুর সহ, মালদা, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন মফ:স্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলে কেটেছে অভিজিৎ-এর জীবন। জীবনের সেই বিপুল সঞ্চয়ই অভিজিৎ-এর লেখায় নানা বৈচিত্র উঠে এসেছে। তার যাবতীয় লেখায় তাই মাটি ছোঁয়া মানুষের জীবনের সঙ্গে লগ্ন। গল্পকার অভিজিৎ সেন বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ। তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে,

> "ছোটোগল্প কিংবা বড়োগল্পের ক্ষেত্রে আসর জমাতে বসে সচেতনে তিনি বাংলা সাহিত্যের এই মাধ্যমটিকে স্বতন্ত্র মাত্রায় ঋদ্ধ করেছেন। ছোটোগল্প রচনায় তার স্বতন্ত্র বহুমাত্রিক।"[১]

সত্তর-আশির দশকের পরিবর্তিত সমাজ ও সময়কে অভিজিৎ তার গল্পে নান্দনিক আয়োজনে ধরেছেন। প্রত্যেক যুগেই সচেতন সাহিত্যিকদের মধ্যে থেকে থেকে প্রচলিত সাহিত্যধারা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা যেমনটা দেখা গিয়েছিল কল্লোল যুগে। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা রবীন্দ্র ভাবনার আদর্শ থেকে সরে আসার আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্যের বিষয় ও পরিধিকে বিস্তৃত করে তারা তাকে কঠোরভাবে বস্তুনিষ্ঠ করতে চেয়েছিলেন ফলে একদিকে প্রাধান্য পেয়েছিল সমাজে নিষিদ্ধ যৌন আকর্ষণ এবং অন্যদিকে নিম্নবর্গের মানুষের জীবচর্চা যদিও সেই তুলনায় গ্রামীণ জীবনের চিত্রণ খুবই কম। কল্লোল যুগ থেকে বেড়িয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিকদের ভাবুকতায় দেখেছেন গ্রাম বাংলার প্রকৃতিকে এবং খুঁজে পেয়েছেন গল্প রচনায় উপাদান। অপরদিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিনি রাঢ় বাংলার মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারকে করেন সাহিত্যের বিষয়। তারাশঙ্করের পরে পাঁচ ছয় দশকের গল্পকারেরা তাদের গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের সামাজিক সংকট, জীবন-যাপনের সংকট, মানুষ মানুষে সম্পর্কের টানাপড়েণ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সচেতন ভাবে কল্লোল গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন নিহত লোককথার বাস্তবতার জগৎ-এ অভিজিৎ সেন ও সেইরকম লোকবিশ্বাস লোকসংস্কার এর মধ্যে খুঁজে পান বিকল্প ধরন। অভিজিৎ সেন,

> "ব্যক্তিগত জীবনের শুভবোধে বিশ্বাসের শিল্পী, অশুভকে পরাজিত করে এক রকমের শুভ বিশ্বাসের প্রতীতি তার গল্পের অন্তিমে ধ্বনিত হয়। তা জীবনের জটিল থেকে জটিলতার মনোলোকের উন্মেষণার মাধ্যমেই জীবন্ত।"[২]

ম্যাজিক শব্দের উৎসে আছে প্রাচীন পারসিক ভাষায় মোটামুটি একই রকম উচ্চারণের স্থান পেয়েছে বহুকাল অবধি।ম্যাজিক হল 'মানা, আত্মা, দেবতা বা সেই অদৃশ্য অলঙ্ঘণীয় শক্তিকে তুষ্ট করা অবশ্য সহজ ছিল না, তাই জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে মানুষকে। এর মূল নিহিত রয়েছে যেখানে অনিশ্চয়তা বোধে।বিশেষ কিছু প্রাপ্তির আশা যেখানে, অথচ সেই প্রাপ্তি সহজে আমাদের করায়ও হতে চায় না, সেখানেই মানুষ নানা ধরনের জাদুর আশ্রয় নেয়,নিয়ে থাকে।"[৩]

অন্য আর একটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'বস্তু এবং ঘটনার বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ না জানলে, যে কোনো কিছুই জাদু বা ম্যাজিক বলে প্রতিপন্ন হতে পারে অজ্ঞ মানুষের কাছে। কেমিস্ট্রের ল্যাবরেটরিতে যদি আফ্রিকা কিংবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কোন অরণ্যচর আদিবাসীকে নিয়ে এসে দেখানো হয় যে দুটো লাল জল (অবশ্যই দুটি বিশেষ কিছু রাসায়নিক পদার্থ) মিশিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রণের রংটা হয়ে গেল সাদা, তাহলে তার কাছে ঐ ঘটনাটা জাদু বলেই প্রতীত হবে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাদু সংস্কার যার আছে, সে নিজে সেটাকে সে ভাবে দেখতে চায় না, তার মতে সেটি হলো দৈব ব্যাপার। এটা ঠিকই যে মনের মধ্যে আদিমতার শিকড় যত বেশি গভীর ভাবে প্রোথিত থাকে, জাদুর উপর আস্থার পরিমাণটাও ততই বেশি হয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিক্ষা, সংস্কৃতির পরিশীলন এমনকি বিজ্ঞানের পরিশীলনও ঐ জাদু প্রত্যয়কে উৎপাটিত করতে পারে না মন থেকে। দ্রব্যগুণ্টুন বলে এসব ক্ষেত্রে একটা পাশ কাটানোর চেষ্টা দেখা যায় অবশ্য অনেক সময়েই।

মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিকাশে একক ভাবে যদি এমন কোন সর্বজনীন প্রত্যয়ের কথা সন্ধান করি, যার প্রভাব স্মরণাতীত আদিমতম কাল থেকে আজ অবধি বহমান, তা হল ম্যাজিক তথা জাদু শক্তিতে বিশ্বাস। বস্তু এবং ঘটনার অন্তর্লীন জাদুশক্তি সম্বন্ধে এই অবিরাম বিশ্বজনীন বিশ্বাসের নানা ধরনের অভিব্যক্তিই ধর্মবিশ্বাস, আচার, সংস্কার প্রথা ইত্যাদি নানান কিছু গড়ে তোলার পিছনে সক্রিয় থাকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে,

> "এই জাদু বিশ্বাস মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামানোর প্রয়াস থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা পর্যন্ত বহুবিধ ব্যাপারের মধ্যেই প্রতিফলিত। বস্তুত পক্ষে যে কোন ধরনের অলৌকিকতার প্রতি আস্থা রাখার অন্তরালেই ওই বিশেষ ধরনের বিশ্বাসের ঘনীভূত উপাদান লুকিয়ে থাকে।"[৪]

এখন যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী জাদুশক্তিতে বিশ্বাস, মানুষের ইতিহাসে এর প্রাচীনত্ব কত দিনের? সম্ভবত, মানুষ নিজের চিন্তাশক্তিকে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে শিখেছে যখন থেকে এই বিশ্বাস ততদিনেরই, সে ঘটনার পারম্পর্য সে নিজের প্রাথমিক স্তরের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারত না, তার পিছনেই সে কল্পনা করত 'অতিলৌকিক কোন শক্তির, যা থাকতে পারে যে কোন কিছুর সঙ্গে অন্তলীন হয়ে হোক তা ঝড়, হোক তা বৃষ্টি, হোক তা রৌদ্র, হোক নদী, পাহাড়, গাছ, পাথর, পশু। এই অতিলৌকিক যে শক্তিকে সর্বত্রই সে কল্পনা করত, কিছুটা আগেই সেই ম্যানার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।"[৫]

এই সব ম্যানাদের তুষ্টিসাধন এবং রুষ্টিসাধন করার জন্যই তারা ব্যস্ত থাকতো সদাসর্বদা, তাদের ধারণা ছিল এতেই তাদের আহার্য জুটবে, বিপদ নিবৃত্তি ঘটবে, কামতৃপ্তি, শত্রুনিসূদন এবং কষ্ট নিবারণ হবে। বিশেষ বিশেষ কাজ করলে তার ফলশ্রুতি হিসেবে এই সব ঘটনা সহজ সাধ্য হবে, এই হল জাদু বিশ্বাসের আদি কথা। এই অবধি ম্যানা ম্যাজিক এবং আদিমতম ধর্মভাবনা মিলে মিশে একাকার হয়েই থেকেছে।

স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার 'তার বিশ্ববিখ্যাত গোল্ডেন বাও গ্রন্থ মালায় জাদুকে প্রকরণগত ভাবে দু-ভাগে ভাগ করেছেন -

> "ক. অনুকৃতি মূলক (সিমপ্যাথেটিক/হোমিওপ্যাথিক)
> খ. সংস্পর্শ মূলক (কনটাজিয়াস)
> আবার ভাবগত দিক থেকেও সমাজবিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা ম্যাজিক তথা জাদুকে দুই ধরনের বলেছেন -
> ১. শুভকারী (হোয়াইট ম্যাজিক)
> ২. অশুভকারী (ব্ল্যাক আর্ট)
> এরা দু তরফই আবার,
> ১. প্রবর্তক (পজিটিভ/ইনসপিরেটিভ)
> ২. নিবর্তক (নেগেটিভ/প্রিভেন্টিভ)"[৬]

দ্বিতীয় যে ভাবনা অনুযায়ী জাদুর শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ শুভকারী এবং অশুভকারী। নৃতত্ত্ববিদ ব্রনিশ্লউ ম্যালিনৌস্কি তার 'ম্যাজিক, সায়েন্স অ্যন্ড রিলিজ্যন বইতে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার গবেষণা মূলত প্রশান্ত মহাসাগরের টোব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত হলো পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধান সমস্ত সংস্কৃতি বলয়ের মানুষের ক্ষেত্রেই যে তার সিদ্ধান্ত প্রয়োগযোগ্য,সে কথা প্রমাণিত হয়েছে।

এক দিক থেকে বিচার করলে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদির পেছনে যে মানসিকতা কাজ করছে, সেটি শুভকারী জাদুবিশ্বাস থেকেই গড়ে উঠেছে বলা যায়। বৃষ্টি নামতে চাওয়ার জন্য, ফসল ফলানোর জন্য, সন্তান লাভের জন্য, যুদ্ধ জয়ের জন্য, বিত্ত অর্জনের জন্য, আহার্য সন্ধানের জন্য, রোগ নিরাময়ের জন্য - এই জাদুর উপর আস্থার মানসিকতাটিই সক্রিয় থাকে। বস্তুত পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূজা অর্চনা বিশেষ বিশেষ আচার বিধির পালন ইত্যাদি ব্যাপার গুলি উৎসগত ভাবে এই জাদুবিশ্বাসের অন্তর্গত। এই ধরনের জাদুর প্রয়োগ সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা এখানে জরুরী হয়ে উঠেছে, কারণ এর সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধ এবং পবিত্রতা ও পবিত্রতার ধারণা জড়িয়ে থাকে। কারণ ফসল ফলানোর জন্যে শস্য দেবতাকে তুষ্ট করবার চেষ্টায় গোষ্ঠীবদ্ধ নাচ, গান ইত্যাদি আচার, অনুষ্ঠান যথাযথ ভাবে পালন করবার পর, কোনো কোনো সমাজে এমন রীতিও আছে,যেখানে শস্যক্ষেত্রের উপর

নারী পুরুষের অবাধ ও যথেচ্ছ মিলন ঘটে ওই আচার বিধিরই অবশ্য পালনীয় অঙ্গ হিসাবে। এক্ষেত্রে এই অবাধ ছাড়পত্র কিন্তু ঐ জাদুর সাফল্য ঘটানোর সুবাদেই, কেন না পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আদিবাসী সমাজ কিন্তু যৌন বিষয়ে সাধারণ ভাবেই অত্যন্ত রক্ষণশীল। 'বহুচারিতা' তথা 'প্রমিস কুইটি' মূলত তথাকথিত 'সভ্য' সমাজেরই অনুষঙ্গবাহী।

শুভকারী জাদু এবং অশুভকারী জাদু বোধ হয় সমবয়স্ক।কারণ 'শত্রুর অমঙ্গল হোক এবং নিজের মঙ্গল হোক এমন অভীক্ষা একে অন্যের পরিপূরক অতি অবশ্যই। মারন – উচাটন - অভিসার ইত্যাদি বিষয় এই অশুভকারী ইন্দ্রজাল পদ্ধতি বৈদিক সাহিত্যে যথাক্রমে 'কৃত্যা' এবং 'যাতু' রূপে পরিচিত। যাতু যারা ব্যবহার করে তারা যাতুবান-তথা-রাক্ষস বা পিশাচ - বা ডাক/ডাকিনি বলে কথিত। এই রকম একটি যাতু (জাদু শব্দ কি এরই বিবর্তন, না-কি তার ঠিক বিপরীতটাই সত্যি?) দেখি অথর্ব সংহিতার ৫/২২/৫-৭ সূত্রে যেখানে বলা হচ্ছে তকমন (জ্বরবিকার) যেন এই মন্ত্রের উচ্চারণকারী যারা শত্রু সেই পর্বতের ওপারে মজবুত বা মহাবৃষ বা বাহলিকদের দেশে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের গ্রাস করে।"[৭]

প্রবর্তক - নিবর্তক জাদুর সবচেয়ে ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় তাবিজ, কবজ, মাদুলি এবং রত্ন ধারণের মধ্যে। বিপদ, দুর্ভাগ্য, সম্ভাব্য ক্ষতি ইত্যাদিকে ঠেকানোর জন্য এই সবের ব্যবহার প্রায় চিরকালীন এবং বিশ্বজনীন। ভারতীয় পুরাণ বৃত্তের সেই কাহিনী তো সবারই জানা, 'যেখানে কর্ণের অক্ষয় - কবচ - কুন্ডল ভিক্ষা করে চেয়ে এনেই তবে তাকে হত্যা করা সম্ভব হয়েছিল কৃষ্ণ অর্জুনের পক্ষে। এই রকম প্রবর্তক - নিবর্তক জাদুশক্তি ছিল মহাবীর স্যামসনের চুলে, বাই বেলিয় মিথোলজির বিবরণ অনুসারে ফিলিস্তাইনের শাসকদের প্রেরিত সুন্দরী গণিকা ডেলাইলা ছলাকলায় ভুলিয়ে সেই রহস্যটি জেনে নিয়ে, ঘুমের মধ্যে তার চুল কেটে নিয়ে তাকে হীনবল করে দিয়ে বন্দী করেছিলেন।

দেবতার শক্তি অলৌকিক, যুক্তি শৃঙ্খলা দিয়ে তা বিচার করা সম্ভব নয়; দেবতা মৃতদেহে প্রাণদান করতে পারেন। দেবতা সমুদ্রে ডুবে যাওয়া পণ্যতরী ভাসিয়ে তুলতে পারেন। মধ্যযুগের মানুষ এই অলৌকিকতা এবং অতি প্রাকৃতিক উপাদানে বিশ্বাসী ছিলেন।

> "মুকুন্দ চক্রবর্তী আমাদের পরিচিত জগতের মধ্যে অতি-প্রাকৃতিক জগৎকে স্থান দিয়েছেন কাব্যে দক্ষতার সঙ্গে। মধ্যযুগের চিত্রকে যথাযথ ভাবে উপস্থাস্থিত করতে কবি অলৌকিকতা ও অতি প্রাকৃতিক উপাদান এনেছেন। ধনপতির আখ্যানে 'কমলে - কামিনী' প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে অতি প্রাকৃতিক উপাদান। তাকে কেন্দ্র করে রস বিকীর্ণ হয়েছে। ডাকিনী-যোগিনী নিয়ে চন্ডীর মশান যুদ্ধে অতি প্রাকৃত রস উৎসারিত হয়েছে।"[৮]

অভিজিৎ সেনের লেখা অন্যান্য গল্প গুলির থেকে 'দেবাংশী' গল্পটি পরিধির বাইরে গিয়ে মায়া বাস্তবতায় অন্য এক ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। অভিজিৎ সেন মানুষের অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা জাদু বিশ্বাসের বাস্তবতার কথাই বলেন না, যে সমস্ত মানুষ জাদু বিশ্বাসের বাস্তবতার মধ্যে বাস করে তাদের কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি অনেক গুলি গল্পে দেখিয়েছেন কিভাবে এই জাদু কেন্দ্রিক বিশ্বাস তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত কিছুর জন্য নির্ভর করে জাদু বিশ্বাসের উপর। এই রকম জাদু বিশ্বাসের বাস্তবতা নিয়ে রচনা করেন 'দেবাংশী' গল্পটি। 'দেবাংশী' গল্পটি যে অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে রচিত তারা বিশ্বাস করে দেবাংশীর ভর হলে তাকে ছুঁতে নেই, স্বয়ং দেবতা তার শরীরে ভর করে থাকে। তার কথা দৈববানী হয়ে যায়। কালী কিংবা মনসা থানের এক চিমটা মাটি তখন অসাধ্য করতে পারে দৈবী মহিমায়।

> "যক্ষা, হাঁপানি, কুষ্ঠের মতো রোগও সেই মাটি ধোওয়া জল খেলে সেরে যাবে। বন্ধ্যা রমণী সন্তানবর্তী হবে, পঙ্গু নিজের পায়ে হাঁটবে, অন্ধ এই পৃথিবীর আলো বৃক্ষলতা সব দেখবে। বুজে যাওয়া পুষ্করিণী জলে-মাছে কেলি করবে, বাঁজা গাই তার দুপুরে ডাক তুলবে পাড়া কাঁপিয়ে, যে

গাইয়ের বাছুর মরে দুধের অভাবে, তার মরা ওলানে দুধের বান ডাকবে। সাপ, বিছা, ভূত, প্রেত, মাদার আর জিনের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে কোলের শিশু, পোয়াতি স্ত্রীলোক। মরে যে সব লাউ-কুমড়ো-সিম ঝাঁকায় কেবল জালি আসে আর মরে যায় সে সব গাছও ফল ভারে ঝাঁকা ভেঙ্গে ফেলতে চাইবে।"[৯]

'দেবাংশী' গল্পে সারবান লোহারের দেবাংশী শক্তির খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই অক্ষমতার জোড়েই সারবান অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পায় মানুষের কাছ থেকে। দেবাংশী গল্পে দেখি দেবাংশীর কাছে সাহায্যের জন্য সেতু তার আর্জি জানায়।আর সেই মুহূর্তে দেবাংশী বলেন-

"তোর মুশকিল যি আসান করি দিমো,তয় তুই কি দিবু মোক্?'
তার উত্তরে ভক্ত বলবে-
- 'দিমো মাও দিমো। ক্ষীর, মুরগা আর উখড়া বাসাতার সরা দিমো তুমাক্'।
- দিমেন তো ঠিক? ভুলবু নাই তো?'
- 'না মাতাজি, এলা কি ভুলার মানাগুনা?'
- দেখেক বাপ, মোক্ অতুষ্টি করেন না'।
- 'তবি এই নে...।"[১০]

দেবাংশীর এই কাজের জন্য দৈত্যারি দেবাংশীকে তার বাড়িতে ডেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়।দেবাংশীকে অশ্রদ্ধা করার জন্য ভয় পায়। সেও তো এই পরিবেশেই মানুষ। উপরে যত তাচ্ছিল্য দেখাক না, ভিতরে সে অস্থির হয়ে ওঠে এবং বউয়ের চোপার সামনে অপরাধীর মতোই মুখ করে থাকে।পরিবেশের প্রভাব এমনই যে মানুষ যুক্তিগ্রাহ্য সত্য কথা বলতে ভয় পায়। দৈত্যারি স্ত্রী এই ঘটনায় স্বামীর অমঙ্গল হবে এই আশঙ্কায় দেবাংশীকে তুষ্ট করার জন্য, - 'বড়ো সিধা পাঠায়'।[১১] কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। দেবাংশীকে অপমান করার ছ-সাত দিন পরে দৈত্যারি সাপে কেটে মারা যায়। এই ঘটনায় ঐ অঞ্চলের সমস্ত মানুষের বদ্ধমূল ধারণা হয় দেবাংশীকে অপমান করার জন্য দৈত্যারি সাপে কেটে মারা যায়। এর ফলে ওই অঞ্চলের মানুষের দেবাংশীর উপর আস্থা বেড়ে যায়। সবাই দেবাংশীর খ্যাতি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই দেবাংশীর কাছে আসতে থাকে নিত্যনতুন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। দৈত্যারি মৃত্যুর পর অনেকেই দেবাংশীর কাছে জমি জমার সমস্যা নিয়ে আসে, দেবাংশীর রায় মেনেও নেয়,যেমনটা রোহিনী মেনে নেয়।

গল্পের মধ্যে দেখা যায় ভক্তের আর্জি অনুসারে দেবাংশীর দেওয়া তাবিজ, কবজ দেবার রীতি। গল্পাংশে যখন মানুষ বলে –

-'মাতাজি মোর চ্যাংড়াগুলা বাঁচে না ক্যান্? তিন তিনটা কাচা যাবার পর এমন এ্যাটা মাওর আছে,তে সিটাও বুঝিন যায়।
মাতাজি'
- দেবাংশী সারবান অস্ফুটে কি সব শব্দ করে,হাসে, গোঙ্গানো স্বরে কি সব বলেও।বিরাম তার মুখের কাছে কান রাখে। তারপর বলে'
- 'তোমার ঘর বন্দ করবা হোবে। উত্তর থিকা দক্ষিণে শনি আর মঙ্গলে কু-বাসাত বয়। কি বয়না?'
- 'হুঁ মাতাজি, বয়'।
- মাদারের কু-লজর আছে ঘরোৎ। ই লেও চামরের চুল। তাবিজ করে ছাবালের মাজায় ঝুলাবা।[১২]

অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' গল্প ছাড়াও 'ডাইন', 'স্ফিংকস', 'জেহাঙ্গী', 'লক্ষিন্দর ফিরে এলো', 'ফাল্গুনী রাতের পালা' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে জাদু বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে চরিত্রগুলি বাস্তবমুখী হয়ে উঠেছে।লক্ষ্য করলে 'স্ফিংকস' গল্পটিতে সুরঞ্জনের মতো একজন শিক্ষিত সরকারি কর্মজীবীকে বশ করতে সক্ষম হয়েছিল আমতী,তার জন্য আমতীর

দীর্ঘ এক মাস ধরে পেটকাটি বুড়ির থানে মানত করতে হয়েছিল। 'ডাইন' গল্পে দেখি গোচ ও তার স্ত্রী ডালি দুইজনে মিলে সন্তান ধারণের জন্য কবিরাজের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল।আজও আদিবাসী সমাজের মানুষেরা অবহেলিত অসহায়েতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা জাদু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে থাকে। তার পরোক্ষ প্রমাণ স্বরূপ ধরা পড়েছে 'ডাইন' গল্পটিতে।যেখানে কবিরাজ তার তান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে নির্বাচন করে দিচ্ছে কে দোষী আর অদোষী।

অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' গল্পে জাদু বিশ্বাসকে নিখুত চিত্রটি ফুটে উঠেছে পরা বাস্তবতাকে সামনে রেখে। যেখানে রোগ, ভোগ প্রতিকূল থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা, সংকট মুক্তির উপর থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য নির্ভর করছে ওঝা, গুনিন, পুরোহিত এবং কবিরাজের দেওয়া নির্দেশকে। অভিজিৎ সেন যখন সত্তর দশকের সময় বাংলা গল্প লিখছেন সেই সময় সমাজে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। তার লেখা গল্প স্ফিংকসে শিক্ষিত চাকরিজীবী সুরঞ্জন এর মত ব্যক্তিত্ব যেন নিজে থেকে ধরা দিয়েছে আমতীর জাদু বিশ্বাসের কাছে। অভিজিৎ সেন ছিলেন জীবনের শুভবোধে বিশ্বাসের শিল্পী। অশুভকে পরাজিত করে এক রকমের শুভ বিশ্বাসের প্রতিতি তার গল্পে অন্তিমে ধ্বনিত হয়।যদিও তা কোনো প্রকার ছক বা ফর্মুলা মেনে চিত্রিত নয়। তা জীবনের জটিল থেকে জটিলতর মনোলোকের উন্মেষণার মাধ্যমেই জীবন্ত।

**তথ্যসূত্র :**

১. হোসেন, সোহারাব, 'বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি', করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ২১৮
২. তদেব, পৃ. ২১৯
৩. চট্টোপাধ্যায় সৌগত, 'লোকসংস্কৃতি আজকের ভাবনায়', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল, ২০২২, পৃ. ৩৪
৪. সেনগুপ্ত পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপনি, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৫৯
৫. তদেব, পৃ. ৬০
৬. তদেব, পৃ. ৬১
৭. তদেব, পৃ. ৬৫
৮. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, 'আদি-মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রজ্ঞা বিকাশ, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৭৮৬
৯. সেন, অভিজিৎ, 'পঞ্চাশটি গল্প', ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১১৪
১০. তদেব, পৃ. ১১৫
১১. তদেব, পৃ. ১২৫
১২. তদেব, পৃ. ১২০

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১. চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, 'বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ', বামা পুস্তকালয়,২৬ শে জুন, ১৯৯৮
২. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রজ্ঞা বিকাশ, জুন, ২০১৫